Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 089-110
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

গ্রামীণ অর্থনীতির সেকাল ও একাল-একটি পর্যবেক্ষণ

সরদার সৈয়দ আহমেদ*

১. ভূমিকা

এ প্রবন্ধটি আমার নিজ গ্রামকে নিয়ে লেখা। গ্রামটির নাম আটিপাড়া। গ্রামটি বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার বামরাইল ইউনিয়নাধীন। জনশ্রুতি আছে যে, এ গ্রামে ৭ সহোদর সরদার বসতি স্থাপন করেন। এ কারণে এ গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীর পদবী সরদার। এলাকাটি বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। আটিপাড়া গ্রামটি ফলের বাগানের জন্য বিখ্যাত ছিল। ফলের বীজ বা আটির প্রাচুর্য্যের জন্য হয়ত আটিপাড়া নামকরণ করা হয়েছে। গ্রামটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, মনোমুগ্ধকর। গ্রামের দক্ষিণে ঠান্ডা বিবির খাল। পূর্বদিকে কিছুদূর পরে সিকারপুর-গৌরনদীর খাল এবং তার নিকটেই সুগন্ধা নদী (বর্তমানে যা সন্ধ্যা নদী নামে পরিচিত)। গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব পাশ দিয়ে ঢাকা বরিশাল হাইওয়ে অতিক্রম করেছে। গ্রামটির উত্তর দিকে আরেকটি ছোট খাল প্রবাহিত। এক সময় নৌকাই ছিল গ্রামের যাতায়াত-পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম। ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার পর থেকে নালা খালগুলো ভরাট হয়ে মরে যাওয়ার ফলে নৌকা চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। মেঠোপথে এখন রিক্সা, ভ্যান এবং নসিমন চলাচল করে। সন্ধা নদীর মুখে সুইস গেট দেয়াতে সিকারপুর-গৌরনদী খালটি ভরাট হয়ে গেছে। জয়শ্রীতে ঠান্ডার খালের মুখ বন্ধ করে ঢাকা-বরিশাল হাইওয়ে করা হয়েছে। এই গ্রামে এক সময় আউশ, আমন ধান উৎপাদিত হতো। লোকজন সুখে-শান্তিতেই ছিল। শিক্ষার হার ছিল খুবই কম। অধিকাংশ লোকজন ছিল কৃষক। বরিশাল জেলার মধ্যে উজিরপুর উপজেলায় শিক্ষার হার বেশী। উজিরপুর উপজেলার মধ্যে শিক্ষার দিক থেকে এ গ্রামটি অগ্রগমী। বর্তমানে শিক্ষার হার শতকরা ৮০ ভাগ। সময়ের পরিবর্তনে গ্রামের অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের অর্থনীতি ও জীবন যাত্রারও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সুদীর্ঘ প্রায় ৬০ বৎসরের ব্যবধানে গ্রামীন সমাজের পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করেই এ প্রবন্ধটি লেখা। প্রবন্ধ লিখতে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি। প্রাথমিক কোন উপাত্ত সংগৃহীত হয়নি। কেবলমাত্র সেকেন্ডারী উৎস থেকে কিছু তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক (অব:), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি। প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব।

২. আর্থ সামাজিক অবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ধান, নদী খাল এ নিয়ে বরিশাল। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত এ জেলা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের অন্যতম জেলা। সতত গতি পরিবর্তনশীল এখানকার নদ-নদী ক্রমাগত ভাঙ্গন ও ভূমি গঠনের কাজ চলছে। তাই এ ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর এখানকার মানুষ নিয়ত সংগ্রামশীল। এ অঞ্চল প্রাকৃতিক দূর্যোগপূর্ণ এলাকা। প্রায় প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয় এবং ১০/২০ বৎসর ব্যবধানে বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়াতে হয়ত এত প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংগঠিত হয়ে থাকে। সম্রাট আকবরের সভা কবি আবুল ফজল এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ১৫৮৪ সালে বরিশাল জেলার উপর দিয়ে এক প্রবল ঝড় বয়ে যায় এবং তাতে প্রায় ২,০০,০০০ লোক মারা যায়। ১৭৮৭ সালে বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হলে দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৮২২ সালে এক ভয়ানক জলপ্লাবন হয়েছিল। এতে এক লক্ষেরও বেশী লোক মারা যায়। ১৮৭৬ সালের সামুদ্রিক ঝড় ও প্লাবনে এক লক্ষ লোক মারা যায়। ১৯৬৫ সালে প্রায় ১৭ হাজার লোক মারা যায়। ১৯৭০ সালের সামূদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলের জেলাসমূহে ৫ লক্ষেরও বেশী লোক প্রাণ হারায় (জেলা গেজেটিয়ার-১৯৮৪)। ২০০৭ সালের মহা প্রলয়ংকারী ঝড়ে উপকূলীয় জেলাসমূহে ১৭ লক্ষ ৭৮ হাজার গবাদি পশু মারা যায় এবং ৫ লক্ষ হেক্টর জমির ফসলের এবং ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার বাড়ী ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং ৯ লক্ষ ৫৭ হাজার আংশিক ক্ষতি সাধিত হয় (IUCN-2008)। বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে এ অঞ্চলের লোকেরা টিকে আছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ বার বার তাদের কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছে। তবু তারা সাহসিকতার সঙ্গে টিকে আছে। এত দূর্যোগের পরেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলের লোকেরা খুব খারাপ অবস্থায় নেই। J. C Jack লিখেছেন–"স্বাভাবিক বছরে অর্থাৎ যদি অনাবৃষ্টি, খরা বা অকাল বন্যা না হয় জেলার মোট খাদ্য উৎপাদনে শতকরা ৩৩ ভাগই জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।" শস্য উৎপাদন বৃষ্টিপাতের চেয়ে ঝড় ও প্লাবনের উপরেই অধিক নির্ভরশীল। ফলে এখানকার অর্থনীতি প্রকৃতি নির্ভর। ১৫৮৬ সালে রালফ ফিচ, ১৫৮৪ সালের মহাপ্লাবনের দুই বছর পরে বাকলা এলাকা (বরিশাল) পরিদর্শনে আসেন। তিনি বলেন– "দেশে প্রচুর খাদ্য, সূতীবস্ত্র ও রেশমী বস্ত্র ছিল। ঘরবাড়ি গুলো অত্যন্তসুন্দর এবং উঁচু রাস্তাগুলো ছিল বেশ চওড়া। লজ্জা নিবারণের জন্য সামান্য বস্ত্র খন্ড ছাড়া লোকজন আর কিছুই পরিধান করত না। মহিলারা গলায় এবং বাহুতে রূপার অলংকার এবং পায়ে রূপা ও তামার খাড়ু পড়ত এবং আঙুলে হাতির দাঁতের তৈরী আঙ্গুরী পড়ত।"

১৮৮১ এবং ১৮৮২ সালে তৎকালীন জেলা কালেক্টর জেলা সফর করে এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "এ জেলার অধিবাসীগণ দারিদ্রের অভিশাপ মুক্ত। উক্ত সময়ে কৃষি খামার গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল ফলেছে। প্রতি বছরই জমির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।" বরিশাল জেলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। জনসংখ্যার অধিকাংশ এখনও কৃষির উপরই নির্ভরশীল। দক্ষিণ অঞ্চলীয় জেলাগুলোর মধ্যে এ জেলার ভূমি খুবই উর্বর। যুগ যুগ ধরে এ জেলা "বাংলার শস্য ভান্ডার" নামে পরিচিত। ১৮৮৬ সালে এইচ , বিভারেজ এ জেলাকে "কৃষির ম্যানচেষ্টার" বলে অভিহিত করেছেন। এ জেলার গ্রামীন সমাজ সম্পূর্ণ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। জমির আয় থেকে তাদের জীবন স্বাচ্ছন্দে কেটে যেত। এ জেলার জীবন ধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল বলে বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকেও এখানকার অধিবাসীরা আত্মতৃপ্ত ছিল। জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪ এ বলা হয় যে, "জেলার অর্থনীতিতে ধানের পরেই গুরুত্ব নিয়ে আসে ফলের বাগান। প্রায় সব বাড়ীতেই রয়েছে ফলের বাগান। এ সব বাগানেই সুপারি, নারিকেল, আম , খেজুর প্রভৃতি গাছ প্রচুর দেখা যায়।"

সরদার সৈয়দ আহমেদ ঃ গ্রামীণ অর্থনীতির সেকাল ও একাল-একটি পর্যবেক্ষণ ৯১

শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে এ জেলা অনগ্রসর ছিল। বর্তমানেও এ অবস্থার তেমন একটি উন্নতি হয়নি। হাতে গোনা কয়েকটি বৃহৎ শিল্প আছে। প্রাচীনকালে লবণ শিল্পের জন্য এ জেলার খ্যাতি ছিল। জেলার কুটির শিল্পের মধ্যে তাত ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মৃৎ শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প, নৌকা বানানো শিল্প, শীতল পাটি তৈরী শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল।

এ জেলার জনগণের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তেমন ঝোঁক ছিল না। বাহিরের জেলা থেকে লোকজন এসে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করত। এ জেলা থেকে চাল, ডাল, মরিচ, পান, পাট, নারিকেল, সুপারী, মাছ ইত্যাদি রপ্তানী হত। জেলায় পণ্য আমদানীর চেয়ে রপ্তানী হত বেশী। এখানকার অর্থনৈতিক জীবনধারার সঙ্গে বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নদ-নদীর উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা ছিল। কলিকাতার সঙ্গে নৌ-পথে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। নদ-নদী ভরাট হয়ে যাওয়াতে এ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং এ কারণে এ জেলার অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে মন্থরতা পরলক্ষিত হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য আশানুরূপ সম্প্রসারিত হয় নাই। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে এ জেলা বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে চাল উৎপাদনে উদ্ধৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় পরিণত হয়। এ অঞ্চলে নদী-খাল বেশী হওয়াতে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য। বর্তমানেও এ জেলায় ইরি (বোরো) চাষাধীন জমির তুলনায় আমন চাষের জমির পরিমাণ বেশী। এ জেলার কৃষকেরা খুবই ঋণগ্রস্ত ছিল। এ জেলারই অধিবাসী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক বাংলার প্রধান মন্ত্রী হিসাবে ১৯৩৭ সালে প্রজা কোয়লিশন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। তার মন্ত্রী পরিষদ ১৯৩৮ সালে 'বঙ্গীয় কৃষি ঋণ আইন' 'ঋণ সালিশী আইন' এবং 'বঙ্গীয় প্রজা স্বত্ব আইন' পাশ করে। এ সব আইনের ফলে ঋণভারে জর্জরিত কৃষক সমাজ, অর্থলিপ্সু মহাজনদের কবল থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পায়। ১৯৫০ সালে জমিদারী উচ্ছেদ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হলে জমিদারদের সব রকম স্বত্তাধিকার বিলুপ্ত হয় এবং ভূমি চাষী প্রজাগণ নিজ নিজ কর্ষিত জমির উপর স্থায়ী মালিকানা লাভ করে। এ আইন কার্যকরী হওয়ার ফলে প্রকৃত কৃষিজীবিদের ভাগ্যের পরিবর্তন সূচিত হয়।

১৮৭৬ সালে এইচ.বিভারেজ বরিশাল জেলার অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে এক সমীক্ষায় বলেন–" বাংলার অপরাপর অংশের তুলনায় বাখরগঞ্জে অভাব অনটন কম। এই জেলার ভূমি উর্বরা। এখানকার রায়তগণ প্রচুর স্বচ্ছলতার মধ্যে বাস করেন। তাদের প্রচুর পরিমাণ ধান চাল আছে। প্রত্যেক খানার ডোবায় যথেষ্ট মাছ আছে এবং বাগানে নারিকেল, সুপারি, কলা ইত্যাদি প্রচুর আছে। লবণ, কাপড় চোপড় এবং তামাক ছাড়া অন্য কিছু তাদের কিনতে হয় না।"

W.W Hunter ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাকেরগঞ্জ জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বলেন–"জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল। এখানকার প্রায় প্রত্যেক অধিবাসী এমনকি গৃহভৃত্যগণও অল্প-স্বল্প জমির মালিক।" W.W Hunter ১৮৭৫ সালে এবং H.Beveridge ১৮৭৬ সালে এ জেলার কৃষকদের অবস্থা ভাল বলে উল্লেখ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কতগুলো মৌলিক কারণে কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। J. C Jack এর Final Report on the Divisional Survey & Settlement, Operation Bakergonj District 1910 মোতাবেক জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ আর্থিক অভাব অনটন এবং দুঃখ দূর্দশার মধ্যে বাস করত।

১৯৪০-৪২ এবং ১৯৪৫-৫২ সালের ভূমি জরীপ পরিচালনার সময় জেলার অধিবাসীদের জীবন যাত্রার অর্থনৈতিক মান পরিমাপ এবং সে সঙ্গে দারিদ্রের অবস্থা জানার জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়।

উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, জনসংখ্যার ৪০.২ ভাগ স্বাচ্ছন্দের মধ্যে, ১৭.৭ ভাগ স্বাচ্ছন্দের নিম্নস্তরে ২১.৬ ভাগ উপবাসের উপরের পর্যায়ে, এবং ২০.৫ ভাগ উপবাস পর্যায়ে ছিল (জেলা গেজেটিয়ার) ১৯৮৪ (পরিশিষ্ট টেবিল-১)।

উজিরপুর উপজেলা বরিশাল বিভাগের অন্যতম প্রাচীনতম জনপদ। পাল ও সেন আমলে বৃহত্তর বরিশাল চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। সুগন্ধা নদীতে দ্বীপের পর দ্বীপ সৃষ্টি হয়ে চন্দ্রদ্বীপের ভূ-খন্ড গঠিত। উজিরপুর-গৌরনদী প্রাচীনতম জনপদ বলে শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে বেশ অগ্রসর ছিল। কবি বিজয় গুপ্ত ১৫ শতকে মনসা মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি ফুল্লশ্রী গ্রামে (পন্ডিতনগর) জন্মগ্রহণ করেন। উজিরপুরের শিকারপুর নিবাসী কালিকান্ত শিরোমনি সংস্কৃত ভাষায় একখানা মহাকাব্য রচনা করেন। বাংলা ভাষার প্রথম কবি মীন নাথের জন্ম চন্দ্রদ্বীপে। উজিরপুরের যোগীর কান্দা গ্রামে তাঁর বসতি ছিল। সেন ও পাল আমলে এ অঞ্চল সংস্কৃতি ও বাংলা চর্চার জন্য খ্যাতি অর্জন করে। এ অঞ্চলে বহু পন্ডিত লোকের জন্ম হয়। কালি প্রসন্ন ভট্টাচার্য এ থানা তথা বরিশাল জেলার প্রথম এম.এ. পাশ (১৮৭৬)। শম্ভু চন্দ্র বাচস্পতি কলকাতায় সংস্কৃতি কলেজে ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষক ছিলেন (সিরাজ-১৯৯২)। উজিরপুর উপজেলার পূর্ব সীমান্ত সংলগ্ন বাবুগঞ্জ উপজেলার বাহেরচর গ্রামে প্রখ্যাত কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর জন্ম। উজিরপুর উপজেলার উত্তর প্রান্ত সীমায় গৌরনদী উপজেলার বাটাজোরের অশ্বিনী কুমার দত্ত স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তিনি ১৮৯৮ সালে এক কালের বাংলার অক্সফোর্ড নামে খ্যাত বরিশাল বি.এম. কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি তার নিজের নামে ১৯২৬ সালে বাটাজোরে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পিতা বিচারক ব্রজমোহন দত্ত বি,এম স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৯ সালে ২৩ ডিসেম্বর বরিশালে ইংরেজী শিক্ষা চালু হয়। ১৮৫৩ সালে এটি বরিশাল জেলা স্কুলে পরিণত হয়। ১৮ শতকের মাঝামাঝি থেকে ১৯ শতকের প্রথম ভাগে উজিরপুর, সিকারপুর এবং বামরাইল সহ অন্যান্য স্থানেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। শেরে-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক উজিরপুর উপজেলা সংলগ্ন বানরীপাড়া উপজেলার চাখার গ্রামের অধিবাসী। ১৯৪০ সালে তিনি চাখার ফজলুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল মনিষীদের প্রচেষ্টায় বহু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। স্বাধীনতার পূর্বেই উজিরপুর থানাধীন শিকারপুরে শের-এ-বাংলা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৬৮)। আটিপারা গ্রাম নিবাসী প্রফেসর আব্দুর রব তালুকদার এবং প্রফেসর মসিউর রহমান উক্ত কলেজটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আমি নিজেও এক সময় উক্ত কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক ছিলাম। বর্তমানে উজিরপুর উপজেলায় ১৭৫ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫০টি হাই স্কুল, ১২টি কলেজ, ৬টি সিনিয়র মাদরাসা এবং ১৬টি দাখিল মাদরাসা রয়েছে (বিবিএস-২০১১)।

আটিপাড়া গ্রামও বহু সংখ্যক গুণীজনের জন্ম স্থান। এক সময়ের নামকরা আলেম মুজিবুল্লাহ মুনির এই গ্রামেরই অধিবাসী। ১৯১৪ সালে আটিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। সানুহার গ্রামের অধিবাসী মেছের উদ্দিন আহমেদ (মেছের মাষ্টার) ১৯২৩ সালে ডিগ্রী পাস করেন। তিনি এ উপজেলার প্রথমদিকের মুসলিম গ্র্যাজুয়েট। জাতীয় অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম আটিপাড়া গ্রামেরই সন্তান। তিনিই এ উপজেলার প্রথম মুসলিম মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের (এম.এন.এ) সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সরদার ফজলুল করিমের ভাই মৌজে আলী সরদার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। মেছের উদ্দিন আহমেদ ১৯৩৭ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৭০ সালে তাঁর ছেলে এম.এ.মতিন এবং তাঁর ভাইয়েরা এম.এ.হাইস্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আমি নিজেও উক্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠাকালীন

শিক্ষক ছিলাম। মৌজে আলী সরদার আটিপাড়া ফাজিল মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ডা. সৈয়দ আব্দুল মালেক (স্বাস্থ্য বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক) এবং সৈয়দ হোসেন আলীর উদ্যোগে আটিপাড়া হাইস্কুলটি স্বাধীনতার পূর্বেই স্থাপিত হয় (১৯৬৮ সালে)। 'সন্ধ্যা নামে ও মাটির মায়া' কাব্যের লেখক ফজলুল হক ছিলেন সত্তর দশকের একজন কবি। তিনি উক্ত স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

৩. গ্রামটির বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাত সমূহ

ক. কৃষি খাত সমূহ

নিম্নে গ্রামটির কৃষির বিভিন্ন খাত সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হল ঃ

ক.১ শস্য খাত ঃ এ গ্রামের অর্থনীতি এক সময় পুরোপুরি কৃষি নির্ভর ছিল। অবশ্য তখন জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ। জনসংখ্যার অধিকাংশ ছিল কৃষি নির্ভর। কৃষিতে পশু শক্তির ব্যবহার ছিল ব্যাপক। নানা জাতের ধানের আবাদ হত। আউশ ধান এবং আমন ধান ব্যাপক আকারে চাষাবাদ হত। বেনামুড়ি, কটকতারা, কালি হাটিয়া, হাটিয়া, চাঁনতারা নামক নানা জাতের আউশ ধানের চাষ হত। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে আমন ধানের চারা রোপন করা হত। কুমড়া গইর, চাউলা মাঘী, কার্তিক শাইল, দুধ মনা, লতা শাইল, লোতর, কাউয়া ঠুটি ইত্যাদি ধানের চারা রোপন করা হত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে নানা জাতীয় আমন ধানের বীজ আউশের সঙ্গে অথবা পাটের সঙ্গে মিশ্র ফসল হিসাবে বোনা হত, এলাকায় যা লাম ধান হিসাবে পরিচিত। এ সকল ধানের পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লতার মতো বেড়ে উঠার ক্ষমতা ছিল। বন্যায় এ সকল ধানের ক্ষতি করতে পারত না। এ সব ধানের গাছ বেশী লম্বা হত বলে গো-খাদ্য বেশী পাওয়া যেত এবং জ্বালানীর যোগানও বৃদ্ধি পেত। ধান গাছের শেষ অংশ পচে জমিতে সার উৎপাদিত হত।

বর্তমান কালে ধানের আবাদে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আউশ ধানের আবাদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে । এ গ্রামে ১৯৯৬ সালেও Gross Cropped এরিয়ার ৫৩% জমিতে দেশী আউশের আবাদ হত (BBS-2000)। বর্তমানে এ হার ২৭% এ দাঁড়িয়েছে (BBS-2011) । বোনা আমন নেই বললেই চলে। দু'ফসলী জমি এক ফসলীতে পরিণত হয়েছে। আউশের বদলে ইরির (বোরো) আবাদ বাড়াতে মোট উৎপাদন বেড়েছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার ব্যাপক আকারে বেড়ে যাওয়াতে মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস পেয়েছে এবং সেচের কারণে উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান কালের নানা উফশী জাতীয় ধানের বীজ গ্রামীন মায়েরা আগের মতো মাটির কলসীতে সংরক্ষণ করতে পারে না। মায়ের বীজ ধানের হাড়ি এনজিওরা লুট করে নিয়েছে। ড. আবুল বারাকাত বলেন–" We have lost 25 thousand species of paddy though we have lost these species forever, the genes of those species have been preserved by the developed countries, gene bank for making manifold profit in future by the TNCs." উফশী জাতের ফসলের একর প্রতি উৎপাদন বেশী হলেও পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে। আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে রাসয়নিক সার, কীটনাটশক ও বেশী পানি প্রয়োজন। ফলে জীব বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং পরিবেশের বিপর্যয় ঘটেছে। "The introduction and large scale adoption of Hybrid, HYV and cloned varities have enhanced agricutural output no doubt. But as challanged in recent literature and alternative approaches, these have also contributed in complex way to the ecological degradation not only in terms of affecting bio-diversity but also the fertility of

cropland, polluting water bodies, depleting fish resources and putting the bio-cycle at serious risk." (People's Report-2006)

গ্রাম এলাকায় এক সময় নানা জাতীয় পাট উৎপাদিত হত। সাধারণ মানুষের ভাষায় সে গুলো ছিল শন পাট, মেশতা পাট, সুতী পাট এবং সাত নালা পাট। বর্তমানে শন পাটের আবাদ এক দমই চোখে পড়ে না। অন্যান্য পাটের আবাদ খুবই কম। পাট জাগ দেওয়ার মতো ডোবা নালা নেই এবং পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়াতে পাটের চাষ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। পাট চাষাধীন জমির পরিমাণ Gross Cropped এরিয়ার শতকরা ১.৪০ মাত্র (BBS-2000) । পাট একটি শ্রমঘণ ফসল। পাটখড়ি থেকে পাট সুতা আলাদা করার জন্য প্রচুর শ্রম লাগত। গ্রামের মহিলারা এ সমস্ত কাজে বেশী নিয়োজিত হত। পাটের চাষ হ্রাস পাওয়াতে গ্রামের গরীব মহিলাদের কর্মের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। আগেকার দিনে আমন ধান উঠার পরে ডাল, তৈল বীজ, পিয়াজ-রসুন ইত্যাদি রবি শস্য উৎপাদিত হত। বর্তমান কালে উফসী জাতের ধানের আবাদ বৃদ্ধি পেলেও রবি শস্যের আবাদ ও উৎপাদন ব্যপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ গ্রামের Cropped এরিয়ার ১৬% এ ডাল, ০.৬৬% এ তৈলবীজ এবং ১.৩৩% এ মসল্লা উৎপাদিত হয় (কৃষি শুমারী-২০০৮)। সমস্ত রবি শস্যের অবশিষ্ট অংশ গো খাদ্য এবং জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হত। উফসী বোরোর আবাদ ১৯৯৬ সালে ছিল ৭% যা ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯% এ দাঁড়িয়েছে (কৃষি শুমারী-২০০৮)। Crop diversification হ্রাস পেয়েছে। Crop Rotation ও কম। ফলে জমির উর্বরতা সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। এ গ্রামের তথা উজিরপুর উপজেলায় ও বরিশাল জেলায় Crop Intensity (%) উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৬ সালে জেলা পর্যায়ে Crop Intensity ছিল ১৮১ যা ২০০৮ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৭১ (Agriculture Cencus - 2008)। উক্ত সময়ে উজিরপুর উপজেলায় তা যথাক্রমে ছিল ১৪৭ এবং ১৩৯। জাতীয় পর্যায়ে Crop Intensity ১৭৩ (Agriculture Census - 2008)। IUCN কর্তৃক Impact of Climate Change on Agriculture নামক গবেষণায় কৃষিক্ষেত্রের সমস্যা সম্পর্কে বলা হয়। "Big land ownership and unfavourable land tenurial system and dominance of absentee farmers discourage adoption of modern technologies. Large owner farmer does not cultivate during Rabi season because it is rather losing or he has got asignments otherwise which are more important.While on the other hand, the share cropper does not cultivate because he does not have own animal power and capital. Capital is also commensurate with the level of effort" (IUCN-2008)

ক.২ পশু সম্পদ ঃ গ্রামীণ অর্থনীতিতে পশু সম্পদ এক সময় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখত। পশু শক্তির ব্যবহার করে হালচাষ করা হত। ২/৩ টি গরু ছিল না এমন কোন পরিবারই ছিল না। ১৯৯৬ সালেও খানা প্রতি ১.১০ টি গরু ছিল (BBS-2005)। বর্তমানে বহু পরিবারই গরু-ছাগল লালন-পালন করে না। উপজেলায় উক্ত সময় খানা প্রতি গরুর সংখ্যা ছিল ০.৯৩ এবং ২০০৮ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ০.৮৭ টিতে। পশু শক্তির পরিবর্তে এখন যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার বেড়েছে। মানব শ্রম শক্তির ব্যবহারও হ্রাস পেয়েছে। গরু-ছাগল পালন করে গ্রামের কৃষকেরা কর্ম নিয়োজনের সুযোগ পেত এবং মাংস ও দুধের চাহিদাও মেটাতে পারত। কৃষিতে এখন ট্রাক্টর, মাড়াই যন্ত্র এবং নিড়ানী যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়াতে কৃষি শ্রমিকের কর্মের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে। আমিষের ঘাটতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। দেশে গুড়া দুধের চাহিদা ও আমদানী বেড়েছে। পশু পালন হ্রাস পাওয়াতে এবং সেসঙ্গে গো সারের যোগান হ্রাস পাওয়াতে জমির উর্বরা শক্তি সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আগে অনেক অনাবাদী জমি থাকত। যা গোচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখন গোচারণ ক্ষেত্র নেই এবং ইরি ধানের আবাদের

ফলে গো-খাদ্যের যোগান হ্রাস পেয়েছে। কারণ, ইরি ধানের গাছগুলো ক্ষুদ্রাকার। ডাল সহ অন্যান্য রবি শস্যের আবাদ হ্রাস পাওয়াতে গো-খাদ্যের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। এসব কারণে গো-পালন খরচ বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক.৩ মৎস্য সম্পদ ঃ ছোট বেলায় দেখেছি মাঠ ভরা জল আর জলজ উদ্ভিদ এবং নানা জাতের মাছের ছলা কলা। মাছে ভাতে বাঙালী এখন প্রবাদ বাক্য মাত্র। সর্বনাশা ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রথম দিকেও আমার গায়ের মাঠে বুক ভরা পানি থাকত। নদী, খালে বছরের সব সময় পানি থাকত। তখনকার দিনে এতদ অঞ্চলে মাঠে ঘণ ঘণ ডোবা বানানো হত। নদী খালের পানিতে লবণ মিশ্রিত থাকত। জমিতে লবণাক্ততা হ্রাস করার জন্য এ সমস্ত ডোবা বানানো হত। লোনা পানি ডোবায় জমা হয়ে জমিকে লবণ মুক্ত করত।

এ সমস্ত ডোবায় আবার প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। বর্তমান সময় এ সমস্ত ডোবা নালা ভরাট করে চাষের জমি বাড়ানো হয়েছে। ফারাক্কার কারণেও খাল, নদী শুকিয়ে গেছে। ফলে সেচের পানির সমস্যা ছাড়াও মাছের চরম আকাল দেখা দিয়েছে। ইরি ধানের আবাদ বাড়াতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়াতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। মুক্ত জলাশয়ের মাছ হ্রাস পাওয়াতে গরীব মানুষদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। বরিশাল জেলার মধ্যে উজিরপুর উপজেলায় পুকুরের সংখ্যা বেশি (৭,৮৫৭টি) (District Statistics-Barisal-2011). এখনও গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে অন্তত ১টি পুকুর আছে। পুকুরে যে পরিমাণ মাছ উৎপাদিত হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এছাড়া অনেক পুকুরে লীজে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মাছ চাষ করা হয়। অথচ একসময় এখানে মাছ এতো বেশি পাওয়া যেতো যে, আমরা ভাত না খেয়ে শুধু মাছ খেতাম। এখন উজিরপুর উপজেলায় মাছের আকাল। জেলের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হাজারের নিচে চলে এসেছে এবং মৎসের উৎপাদন ১৫-২০ মেট্রিক টন যা জেলার মধ্যে সর্বনিম্ন। আটিপাড়া গ্রামে বর্তমানে কোন জেলে নেই। (District Statistics-Barisal-2011)

মাছ ধরার নানা রকম ফাঁদ যেমন-চাই-বাইন্যা, ওচা, পলো এবং কৈয়া জাল, এখন আর কোন কাজে লাগে না। এগুলো এখন গল্পে পরিণত হয়েছে। সকাল বেলায় এসমস্ত ফাঁদ থেকে খারই ভরে বাসায় মাছ নিয়ে এসেছি। বৃষ্টির দিনে সন্ধ্যার বুকে ইলিশ ধরেছি। আশ্বিনের ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি ধরেছি। এ সব কিছু এখন কল্পনা, কেবলই স্মৃতির। মৎস্য সম্পদ এখন এমনভাবে হ্রাস পেয়েছে যে, গ্রামে এখন মাছ একটি দামী-বিলাসী খাবার হিসাবে পরিণত হয়েছে।

ক.৪ বৃক্ষ সম্পদ ঃ আমার গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীতে গাছের বাগান ছিল এবং ঝোপঝাড়ও ছিল। আম-জাম নারিকেল, তাল-বেল, গাছ ছিল প্রচুর। এছাড়াও সুপারি বাগান এবং বাঁশ ও বেতের ঝাড়ও ছিল প্রত্যেক বাড়ীতে। ২/৪ টি তাল এবং খেজুর গাছ ছিল না এমন কোন বাড়ীই ছিল না। কালের বিবর্তনে সব হারিয়ে গেছে। নব্বই'র দশক থেকে সরকারের সামাজিক বনায়ণের ব্যাপক প্রচারণা শুরু হলে জনগণ বৃক্ষ রোপনে উৎসাহিত হয়। বৃক্ষরোপণ কিছুটা হলেও ফলবান বৃক্ষ এখন নেই বললেই চলে। এক সময় সবুজ বিপ্লবের জোয়ারে গ্রামের গাছপালা ধ্বংস করে চাষের জমি বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে ধানের উৎপাদন বাড়লেও প্রকৃত পক্ষে খাদ্য ঘাটতি বেড়েছে এবং জ্বালানী সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। জ্বালানী সংকটের কারণে এখন আর তাল খেজুরের রস থেকে গুড় করা হয় না। এতে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ প্রতি বছর অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যাচ্ছে। যা এক ধরণের অপচয়ের সামিল। চিনির দাম কম হওয়াতে এবং গুড়ের দাম বেশী হওয়াতে গুড়ের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে।

নারিকেল সুপারির বাগান ধ্বংস হয়ে গেছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সুপারি গাছে মড়ক দেখা দিয়েছে। বিগত ২০০৭ সালের সিডরে সুন্দরবনের এক তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ সময় উপকূলীয় জেলা সমূহে লক্ষ লক্ষ গাছপালা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ গ্রামেও হাজার হাজার গাছপালা ধ্বংস হয়েছে। বৃক্ষ ঝড় প্রতিরোধ করে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ধরে রাখে ও মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। তাই বৃক্ষ রোপনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

খ. শিল্প ও বাণিজ্য

বরিশাল অঞ্চল শিল্প কারখানায় অনুন্নত। হাতে গোনা কয়েকটি বৃহৎ শিল্প রয়েছে। কুটির শিল্পও তেমন উন্নত নয়। এক সময় এ অঞ্চলের কাঠ দিয়ে নানা প্রকার কুটির শিল্প বিস্তার লাভ করেছিল। গ্রামের লোকেরা কাঠের খড়ম ব্যবহার করত। বর্তমানে পানি নেই বলে নৌকা শিল্প এবং খড়মের উৎপাদন একদমই নেই। পানি না থাকার কারণে মাছ ধরার নানা রকম ফাঁদ তৈরীতে নিয়োজিত লোকজনও নেই। কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে (পরিশিষ্ট টেবিল-৫)। পাটের সিঁকা ও কাথা সেলাই এক ধরণের শিল্প হিসাবে স্বীকৃত ছিল। বর্তমানে এসব কাজে কোন লোক নিয়োজিত নেই। আমার গ্রামের লোকেরা সুখ স্বাচ্ছন্দে বসবাস করত। পরিবারের লোকেরা যার যার জমিতে নিজের প্রয়োজনমত ফসল উৎপাদন করত। বাজার থেকে তারা খুব কম জিনিসপত্রই ক্রয় করত। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে কাপড়-চোপড়, বইপত্র, দিয়াশলাই, কেরোসিন ব্যতীত তেমন কোন দ্রব্যাদি বাজার থেকে ক্রয় করা হত না। বর্তমানের অবস্থা উল্টো।

এখনকার কৃষকদেরকে চাল-আটা, তৈল, পিয়াজ-রসুন, এমনকি মাছ, তরি-তরকারীও বাজার থেকে কিনে খেতে হয়। আগেকার দিনে গ্রামীন অর্থনীতি ছিল নন-মনিটাইজড। আমার এ গ্রামটি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। উদ্বৃত্ত খাদ্য বাজারে বিক্রি করা হত। ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসারের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা এবং পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে পড়ে আমি বহুবার নৌকা পথে গাঁয়ের হাটে তাল-বেল, নারিকেল-সুপারি, বিক্রি করতে গিয়েছি। এখন দৃশ্যপট উল্টো। গ্রামে এখন এ সমস্ত ফল ফলাদি উৎপাদিত হয় না এবং বিক্রির প্রশ্নই আসে না। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত বলে দ্রব্যাদি বাজার জাত করা কষ্ট সাধ্য এবং পরিবহন ব্যয় অনেক বেশী হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় বেশী বলে ফল ফলাদি অবিক্রীত থেকে যায়। বর্তমান সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আটিপাড়া গ্রামে জয় বাংলার হাট নামক একটা হাট চালু হয়। সিকারপুর-দোয়ারিকা ব্রীজ হবার পর থেকে হাইওয়ের পাশে সার্বক্ষণিক বাজার গড়ে উঠেছে।

গ. যাতায়াত ও পরিবহন

৪০/৫০ বছর পূর্বে সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল অসংখ্য খাল বিল নদী নালায় ভরপুর ছিল। প্রবাদ ছিল–ধান, নদী, খাল–এই তিন নিয়ে বরিশাল। আমার গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে দু'টি বড় খাল এবং উত্তর দিকে একটি ছোট খাল প্রবাহিত হত। এছাড়া গ্রামের মধ্য দিয়েও বহুসংখ্যক ছোট ছোট খাল প্রবাহিত ছিল। এ সমস্ত খালে সব ঋতুতেই পানি থাকত। ফলে, সব সময়ই নৌকা চলাচল করতো । নৌকাই ছিল একমাত্র যাতায়াত ও পরিবহনের মাধ্যম। মাঠ থেকে ফসল আনা-নেয়া এমনকি পায়খানা প্রস্রাবের জন্য নৌকা ছিল অপরিহার্য। রাস্তা ঘাট পানিতে ডুবে যেত বলে নৌকায় করেই হাট-বাজার এবং স্কুল-কলেজে যেতে হত। বর্তমান কালে সব খাল শুকিয়ে প্রাণ হারিয়েছে।

সরদার সৈয়দ আহমেদ ঃ গ্রামীণ অর্থনীতির সেকাল ও একাল-একটি পর্যবেক্ষণ ৯৭

ঠান্ডার খালের বুকের উপর দিয়ে জলযানের পরিবর্তে বাস ট্রাকের ছুটোছুটি এবং শিকারপুর-গৌরনদী খালের বুকে হাট-বাজার করা হয়েছে। মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধের কারণে নৌকার জায়গা এখন ভ্যান, রিক্সা, নসিমন, করিমন, ইত্যাদি দখল করেছে। অপরিকল্পিত রাস্তা ঘাট গড়ে উঠাতে বন্যার সমস্যাও মাঝে মধ্যে দেখা দেয়। বন্যার সময় পদ্মা থেকে পানি গোপালগঞ্জ হয়ে উজিরপুরে বন্যা প্লাবিত করে। ঢাকা বরিশাল রোডের পশ্চিম দিকে বন্যা দেখা দেয়।

ঢাকা-বরিশাল রোড হবার পূর্বে অত্র এলাকার জনগণ নৌকাযোগে বরিশাল শহরে যেত। গৌরনদী থেকে বরিশাল পর্যন্ত এক ধরণের বড় নৌকা যাত্রী বহন করত। যার স্থানীয় নাম ছিল গয়না নৌকা। তখনকার দিনে যাতায়াত এত খারাপ ছিল যে, দক্ষিণ অঞ্চলে যেতে হলে জোয়ার-ভাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৌকা চালাতে হত। বাস যোগাযোগ চালু হওয়ার পূর্বে উজিরপুর থেকে ঢাকা আসতে হত বড় নৌকায়। পরবর্তীতে লঞ্চ চলাচল শুরু হলেও লঞ্চগুলি ছিল ছোট সাইজের এক তলা বিশিষ্ট। ১৯৬২ সালে আমি নিজে এক তলা লঞ্চে ২.৫০ টাকা ভাড়া দিয়ে সদরঘাট পৌঁছাই।

ঘ. জ্বালানী

এক সময় আমার এলাকায় তাল, খেজুর এবং নারিকেল গাছের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, মানুষ যার যা খুশিমত অন্যের ফল-ফলাদি এবং গাছের ডগা ব্যবহার করত। অর্থাৎ এসব গাছের ডালপালা গণদ্রব্যের মতই ব্যবহার হত। বাজারে লাকড়ী কেনা বেঁচা হত না। আমার প্রথম জীবনে আমার কর্মস্থল নারায়নগঞ্জের আড়াইহাজারে গরীব মানুষদেরকে ৫ কেজি চালের সঙ্গে ৫ কেজি গাছের ডালা ক্রয় করতে দেখে হতভম্ব হতাম। বৃক্ষ নিধনের ফলে এখন আমার গ্রামেও জ্বালানী অহরহ বেচা-কেনা হয়। বৃক্ষ নিধনের ফলে ফল–ফলাদি এবং গৃহ নির্মাণ কাঁচামালের সংকটও দেখা দিয়েছে। প্রচুর পরিমাণ গাছ না থাকাতে ধান ক্ষেতে যে CFC উৎপাদিত হয় তা নিঃষেশিত না হয়ে পরিবেশকে দূষিত ও উত্তপ্ত করে চলছে। পাটের উৎপাদন হ্রাস পাওয়াতে জ্বালানীর সংকট বেড়ে গিয়েছে। পাট খড়ি এবং ধানের নাড়া ও রবি শস্যের অবশিষ্টাংশ জ্বালানী হিসাবে প্রচুর ব্যবহার হত। উফশী জাতের ধানের খড়কুটা কম হয় বলে জ্বালানীর সংকট তীব্র হয়েছে। গোবরও ছিল একটা উৎকৃষ্ট জ্বালানী। গো-সম্পদ হ্রাস পাওয়াতে জ্বালানীর যোগানের সংকট দেখা দিয়েছে। পারিবারিক শ্রমের একটা বিরাট অংশ এবং পারিবারিক বাজেটের একটি বড় অংশ জ্বালানীর জন্য খরচ করতে হচ্ছে। জ্বালানী কাঠের ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে। ফলে জ্বালানী সংকট দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে। গ্রাম এলাকায় বৃক্ষরোপন বাড়ছে কিন্ত তা অধিকাংশই বিদেশী জাতের। দেশীয় জাতের গাছ লাগালে জ্বালানীর জন্য ডালপালা পাওয়া যেত এবং ফলের যোগানও বৃদ্ধি পেত। দ্রুত জ্বালানী ঘাটতি মেটাতে হলে পাট, ধনচে এবং আখের চাষ বাড়াতে হবে।

ঙ. দ্রব্য মূল্য ও শ্রমিকের মজুরী

দ্রব্য মূল্য একটি স্থানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য করে এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতা নির্দেশ করে। জনগণের জীবন যাত্রার মান নির্ধারণে দ্রব্য মূল্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্রব্য মূল্যের উঠা-নামা জনগণের আয় ও ব্যয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে । আগেকার দিনে অর্থের ব্যবহার বেশ কম ছিল বলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছিল সীমিত। গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল আত্মতোষণমূলক। এর ফলে জনগণের ভোগও ছিল সীমিত। দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতি বা মুদ্রাস্ফীতি অতীতের দিনগুলোতে ছিল খুবই সীমিত। দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা থাকলেই জনগণের ক্রয় ক্ষমতা স্থির থাকে এবং আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয় না।

১৯৫৭ সালে একমন মাঝারী ধরণের চালের দাম ছিল ১০.০০ টাকা। ১৯৬৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩২.০০ টাকা এবং ১৯৭১ সালে আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪২.০০ টাকায়। ১৯৭১ সালে এক সের মশুরী ডালের দাম ছিল ১.০১ টাকা, সরিষা বীজের দাম ছিল ৪.৮২.০০ টাকা, এক সের গরুর মাংসের দাম ছিল ২.২৫ টাকা এবং পিয়াজ-রসুনের সের ছিল ০.৮৬ টাকা। ১০০টি ডিমের দাম ছিল ১৫.০০ টাকা এবং ইলিশের সের ছিল ৪.০০ টাকা মাত্র (টেবিল-১ এবং পরিশিষ্ট টেবিল-২)। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে ১৯৬০-৬১ সালে আমি ৮ টাকায় একটি মাঝারী ধরনের ছাগল এবং ৩০ টাকা দিয়ে একটি মাঝারী গরু ক্রয় করেছিলাম।

পাকিস্তান আমলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও বৃদ্ধির হার ছিল খুবই কম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির হার অনেক বেশী (পরিশিষ্ট টেবিল-২)। ১৯৭০ সালে এক মন চালের দাম ছিল ৪২ টাকা, আর বর্তমানে এক কেজি মধ্যম চালের দাম ৪২ টাকারও বেশী। এর ফলে গ্রামীণ জীবন যাত্রায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে। দারিদ্র বেড়ে চলেছে এবং ধনী দরিদ্রের ব্যবধান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্য মূল্য বা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে মানুষের জীবনের সুখ স্বাচ্ছ্যন্দ গভীরভাবে জড়িত। আমার মনে পড়ে ১৯৬৫-১৯৭০ সাল পর্যন্ত একজন কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ছিল ১.০০ টাকা থেকে ২.০০ টাকা (টেবিল নং-২)।

টেবিল ১: মধ্যম মানের চালের মূল্য বৃদ্ধির চিত্র

সাল	মন প্রতি মূল্য টাকায়	সের প্রতি মূল্য টাকায়
১৯১৫	৬.৬২	০.১৬
১৯২৪	৭.৫০	০.১৯
১৯৩৫	৩.১৯	০.০৮
১৯৫০	৫.০০	০.১৩
১৯৫৭	১০.০০	০.২৪
১৯৬১	২২.০০	০.৫৫
১৯৬৫	৩২.৪৩	০.৮১
১৯৭০	৪২.১৮	১.০৫
১৯৭৬	১১১.৭২	২.৭৯
১৯৮০	২৫৬.০০	৬.৪০
১৯৮৫	৩২০.০০	৮.০০
১৯৯০	৪৪০.০০	১১.০০
১৯৯৫	৫২০.০০	১৩.০০
২০০০	৬০০.০০	১৫.০০
২০০৫	৮৮০.০০	২২.০০
২০১০	১৩৮৮.০০	৩৪.৭০
২০১৩	১৪৪০.০০	৩৬.০০

উৎস ঃ *BBS. Statistical Pocket Book Bangladesh-1996-2012*
জেলা গেজেটিয়ার বরিশাল-১৯৮৪
Monthly Statistical Bulletin Bangladesh-August-2013
জেলা গেজেটিয়ার রংপুর-১৯৯০

তখন এক সের চালের মূল্য ছিল ৬/৮ আনা। অর্থাৎ ১ জন শ্রমিক সারাদিন কাজ করে ৩ সের কিংবা তার কিছু বেশী চাল মজুরী হিসাবে পেত। বরিশাল অঞ্চলে ফসল তোলার সময় ফসলের সাত ভাগের এক ভাগ অথবা আট ভাগের এক ভাগ শ্রমিককে পারিশ্রমিক হিসাবে দেয়ার প্রচলন ছিল যা এখনও কমবেশী বিদ্যমান। কালের বিবর্তনে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অনেক বেড়েছে। ২০১৩ সালে একজন কৃষি শ্রমিক ৮ ঘন্টা কাজ করে ২৫০ টাকা পায়। মোটা চালের মূল্য যদি কেজি প্রতি ৩০.০০ টাকা হয় তাহলে একজন শ্রমিক দৈনিক ৮ কেজিরও বেশী চাল পেত। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে মজুরী ৩০০ টাকা সে হিসাবে ১০ কেজি চাল পায়। স্বাধীনতার পূর্বে যা ছিল ৩ কেজির কিছু বেশী। আগে গ্রাম-গঞ্জে মানুষ সুখ-শান্তিতে থাকলেও দৈনিক মজুররা ছিল খুবই খারাপ অবস্থায়। এ শ্রেণীর লোকই অভাব বা মঙ্গার শিকার। শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের দারিদ্রের অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং জীবন যাত্রার মানেরও উন্নতি হয়েছে (টেবিল-২)।

টেবিল ২: কৃষি শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী (বরিশাল)

সাল	নিম্নতম মুজুরী টাকায়	চালের নিম্নতম দাম টাকায় (সের প্রতি)	মুজুরী চালে সের হিসাবে
১৯৫১	০.৭৫	০.২০	৩.৭৫
১৯৫৫	১.৫০	০.৪২	৩.৫৭
১৯৬১	২.০০	০.৫৫	৩.৬৪
১৯৬৫	২.৫০	০.৬৮	৩.৬৭
১৯৭১	৩.০০	১.০৫	২.৮৬
১৯৭৬	৯.০০	২.৫০	৩.৬০
১৯৮১	১৩.০০	৬.৪০	২.০৩
১৯৮৫	২৫.০০	৮.০০	৩.১২
১৯৯১	৩১.০০	১১.০০	২.৮২
১৯৯৫	৪০.০০	১৩.০০	৩.০৭
২০০১	৬০.০০	১৪.০০	৪.২৮
২০০৫	৯৫.০০	২২.০০	৪.৩২
২০১১	২০০.০০	৩৫.০০	৫.৭১
২০১৩	২৫০.০০	৩০.০০	৮.৩৩

উৎস ঃ *BBS. Statistical Pocket Book Bangladesh-1996-2012*
জেলা গেজেটিয়ার বরিশাল-১৯৮৪, জেলা গেজেটিয়ার রংপুর-১৯৯০
Monthly Statistical Bulletin Bangladesh-August-2013

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের জীবন যাপন স্বাভাবিক থাকে এবং মজুরী বৃদ্ধির তুলনায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বেশী হলে শ্রমিকেরা দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়। আমি উত্তরভঙ্গে মঙ্গা (২০০৩) গবেষণায় দেখেছি, সেখানে কৃষি শ্রমিকের মজুরী স্তর দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম এবং এটাই মঙ্গার অন্যতম কারণ। ঋতুজনিত বেকারত্ব এবং নগদ অর্থের

সংকটে সেখানে মঙ্গা হয়ে থাকে। আমার এলাকায় সবুজ বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বে কৃষি শ্রমিকরা মারাত্মক খাদ্যাভাবে থাকত। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই। অকৃষি খাতের ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে এবং শ্রমিকের মজুরী স্তর উঁচু হওয়াতে তারা খেয়ে পড়ে মোটামোটি ভালই আছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৪. আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবন যাত্রা

জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রামের মানুষেরা এক সময় খুব সাদাসিদে জীবন যাপন করত। সকালে পান্তা ভাত আর মরিচ পোড়া খাওয়া ছিল একটি সাধারণ ব্যাপার। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে মানুষের খাদ্যাভাস পাল্টাতে থাকে। ভাতের বিকল্প হিসাবে আটা খাওয়া শুরু হয়। আটাকে তখনকার সময় নিম্নমানের খাবার হিসাবে গণ্য করা হত। সময়ে পরিবর্তনে মানুসের রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামের লোকেরা এখন রুটি-পরাটা, চা-বিস্কুট দিয়ে নাস্তা করে। অনেক বাড়ীতেই এখন ভাঙ্গা সুটকেসের পরিবর্তে শো-কেস দেখা যায়। শো-কেসে কাপ-পিরিচ, কাঁচের প্লেট সু-সজ্জিত থাকে। গৃহিনীরা মাটির কোন জিনিসপত্র ব্যবহার করে না। এ্যালুমিনিয়াম, মেলামাইন, কাচ এবং চীনা মাটি কিংবা স্টীলের পাত্র ব্যবহার করে থাকে। অনেক বাড়িতে মাটির চুলার পরিবর্তে গ্যাসের চুলার ব্যবহার লক্ষ্য করেছি। গ্রামের লোকদের পোশাক পরিচ্ছদেও আমূল পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। লুঙ্গী-গামছার পরিবর্তে পা-জামা-পাঞ্জাবী এবং শার্ট প্যান্টের ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়েছে। মেয়েরা কাঁচের বেলওয়ারীর পরিবর্তে ইমিটেশন ব্যবহার করে এবং আধুনিক ডিজাইনের পোশাক পরিধান করে। বৈদ্যুতিক বাতির সুবাদে প্রায় বাড়ীতেই টেলিভিশন ব্যবহার করা হচ্ছে। বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ছে। ২০০১ সালে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী খানার সংখ্যা শতকরা ৩১ ভাগ ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে ৪০-৪৫ ভাগ হতে পারে।

গ্রামের অধিকাংশ মানুষের হাতেই এখন অত্যাধুনিক মোবাইল ফোন দেখা যায়। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকেও গ্রামের লোকেরা অধিকাংশই পুকুর, নদী, খালের পানি পান করত এবং কাচা পায়খানা কিংবা খোলা পায়খানা ব্যবহার করত। এখন এসব ক্ষেত্রে ব্যপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে ৯৯% খানা নিরাপদ পানি পান করে এবং ৮৭ ভাগ খানা সেনেটারী পায়খানা ব্যবহার করে।

আর্থ-সামাজিক বিষয় এবং জনগণের জীবন যাত্রার মানের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

৪.১ জনসংখ্যা ঃ গ্রামটির আয়তন ৫৭৩ একর। ২০০১ সালের আদমশুমারী মোতাবেক এ গ্রামের জনসংখ্যা ছিল ২৬৭৩ জন। যার মধ্যে পুরুষ ১২৭৭ এবং মহিলা ১৩২৬ জন। খানার গড় আয়তন ৪.৭ , জাতীয় পর্যায়ে খানার আয়তন ৪.৯ এবং বরিশাল বিভাগ ও জেলায় তা ছিল ৫.০০। খানার সংখ্যা ছিল ৫৬৯। একর প্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব ৪.৬৬ জন। মাথা পিছু জমির পরিমাণ ০.২১ একর। জাতীয় পর্যায়ে মাথা পিছু চাষের জমির পরিমাণ ০.১৩ একর। অধিবাসীরা সকলেই সুন্নী মুসলিম। বর্তমান খানার সংখ্যা ৬১২ । সেই হিসাবে বর্তমান লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৭৬ জন। ১০ বছরের উপরে জনসংখ্যার শতকরা ২৪ ভাগ গৃহস্থালীর কাজে , ১৯ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত এবং ২৫ ভাগ কোন কাজ করে না। ১০ বছরের উপরের জনসংখ্যা শতকরা ৭১ ভাগ এবং নীচের দিকে ২৯ ভাগ। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ও হ্রাস পেয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি হওয়াতে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেবিল ৩: গ্রামের পানি, পয়ঃ এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের চিত্র

	খানার সংখ্যা	শতকরা
নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী	৫৬৭	৯৯.৬৫
সেনিটারী পায়খানা	৪৯৬	৮৭.১৭
বিদ্যুৎ সংযোগ আছে	২১৯	৩০.৪৫
নিজস্ব জমি আছে	৪৬৮	৮২.২৫

উৎস ঃ *B.B.S-2005 Popolation Census Zila-Barisal.*

৪.২ ভূমি মালিকানা ও খামার ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বরিশাল এলাকায় খামার আয়তন ক্ষুদ্র। অকৃষিখাতের প্রসার ঘটলেও মানুষ কৃষির উপরই বেশী নির্ভরশীল। নিজস্ব জমি আছে এমন খানার সংখ্যা শতকরা ৮২ ভাগ এবং ৬২% খানার আয়ের মূল উৎস কৃষি (BBS-2000)। ২০০৮ সালের কৃষি শুমারী মোতাবেক প্রায় ৮০% ফার্ম হোল্ডিং এবং ২০% নন ফার্ম হোল্ডিং। গ্রামের Gross Cropped এরিয়ার পরিমাণ ৭৫১ একর এবং নীট চাষযোগ্য জমির পারিমাণ ৩৯৮ একর। খানা প্রতি গড় Operated জমির পরিমাণ ০.৭৭ একর এবং মাথা পিছু নীট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.৬৫ একর। বর্গা প্রথা আগে ছিল এবং এখনও আছে। অনুপস্থিত ভূ-স্বামীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে বর্গা চাষীর সংখ্যা বাড়ছে। ইরি ধানের ২/৩ অংশ এবং অন্যান্য ফসলের (অর্ধেক) ১/২ অংশ বর্গাদার পায়। ইরির আবাদ শুরু হওয়ার পর থেকে গ্রামে নতুন এক শোষক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। পানির মত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রদান করাতে সেচ যন্ত্রের মালিকরা ফসলের এক চতুর্থাংশ পানির মূল্য হিসাবে নিয়ে নেয়। দেশের অন্যান্য স্থানের মত এতদঞ্চলীয় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা একই রকম হলেও আমার নিজ গ্রামে ভূমিহীনের সংখ্যা কম। গ্রামে এমন কোন পরিবার পাওয়া যাবে না যার অন্তত পক্ষে ভিটে বাড়ীর জমি নেই। কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা মোট খানার শতকরা ২০.৩৮ ভাগ এবং উপজেলায় ২৪.১৫ ও জাতীয় পর্যায়ে তা ৩৫.৯০ ভাগ (BBS-2000)।

W.W Hunter এর নিম্মোক্ত মন্তব্য আমার বক্তব্যের সপক্ষে উপস্থাপন করা হল। তিনি বলেন–"মূলত বাকেরগঞ্জ ছোট ছোট ভূ-স্বামীদের জেলা। প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কিছু কৃষি খামার আছে। এই কৃষি খামারে তারা পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় ফসলাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করে।" এ গ্রামে ভূমি মালিকানায় দেশের অন্যান্য স্থানের মতই বৈষম্য বিদ্যমান। ছোট খামারের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ (BBS-2000)। রংপুর তথা উত্তর বঙ্গের মত ভূমির মালিকানায় ব্যাপক বৈষম্য নেই। ভূমিহীনের সংখ্যা এ গ্রামে খুবই কম। তবে উপজেলা পর্যায়ে তা প্রচুর। সন্ধ্যা নদীর তীরবর্তী গ্রাম সমূহে ব্যাপক নদী ভাঙ্গন হয় বলে উপজেলায় ভূমিহীনের সংখ্যা বেশী (১০.১৩%)। জাতীয় পর্যায়ে একদম ভূমিহীনের সংখ্যা শতকরা ১৪.০৩ ভাগ (BBS-2005)। বরিশাল জেলায় এ হার ৭.৫০% (BBS-2011)।

৪.৩ পেশা ঃ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বরিশাল অঞ্চলেও এক সময় শিক্ষার হার ছিল কম। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা ব্যতীত বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই–এ ধরনের প্রচারণা গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে

পড়ে। এ সব কারণে এ এলাকায় শিক্ষার হার দ্রুত বাড়তে থাকে। শিক্ষা মানুষের গতানুগতিক পেশার পরিবর্তন ঘটায়। এখন আর বাপের পেশাকে ধরে রাখে না। এক সময় অধিকাংশ লোক কৃষিতে নিয়োজিত ছিল কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকের পেশাগত গতিশীলতা এবং ভৌগোলিক গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। রংপুর অঞ্চলে শ্রমিকের পেশাগত এবং ভৌগোলিক গতিশীলতা মন্থর বলে এলাকাটি এখনও মঙ্গাপীড়িত। বরিশাল অঞ্চলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে কৃষি শ্রমিক এখন আর বাপের পেশাকে ধরে রাখেনি এবং জীবিকার তাগিদে ঢাকা এবং খুলনায় পাড়ি জমিয়েছে। খানা সমূহের ২৫ ভাগের আয়ের প্রধান উৎস চাকুরী (আদমশুমারী-২০০১)। দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ ব্যতীত ফসল কাটার মৌসুমে বিভিন্ন রকম ফসলের কাজ যেমন-ধান ঝারা, ধান ভানা, পাট থেকে পাট সুতা আলাদা করা, ফসল শুকানো ইত্যাদি কাজে পূর্বে নারীরা নিয়োজিত হত। রাইস মিলের প্রবর্তনের ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ইদানিং আমি লক্ষ্য করেছি যে, গ্রামের বহুসংখ্যক শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত যুবক বিদেশেও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। তাদের প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাম এলাকার চিত্র পাল্টে দিয়েছে।

৪.৪ শিক্ষা ঃ বর্তমানে এই গ্রামে বয়স্ক শিক্ষিতের হার শতকরা ৮০% ভাগ। নারী শিক্ষার হার দেশের গড় হারের চেয়ে ২৪% বেশী (টেবিল নং-৪)। এ গ্রামে ১টি হাইস্কুল, ১টি ফাযিল মাদরাসা, ২টি প্রাইমারী স্কুল, ৭টি জামে মসজিদ, ২টি ফোরকানিয়া মাদরাসা আছে। বহুসংখ্যক লোক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন। অনেকেই উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত আছেন। সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে বরিশাল বিভাগে শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশী।

আদমশুমারী-২০০১ মোতাবেক বাংলাদেশের শিক্ষার হার ছিল শতকরা ৪৬.১৫ ভাগ, বরিশাল বিভাগে ৫৩.৫৯, বরিশাল জেলায় ৫৫.২৮, উজিরপুর উপজেলায় ৬১.০০ এবং আটিপাড়া গ্রামে তা ছিল ৬৬ % (টেবিল নং-৪)। ২০১১ সালে উজিরপুর উপজেলার শিক্ষার হার অন্য সব উপজেলার চেয়ে কম হারে বেড়েছে এবং তার অবস্থান অনেক নিচে নেমে এসেছে। এর কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন (পরিশিষ্ট টেবিল নম্বর-৩)। এ গ্রামে উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেড়েছে। এখন অনেক বাড়ীতেই বি.এ পাশ, এম.এ পাশ লোক আছে। উজিরপুর উপজেলায় কলেজের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বরিশাল জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা তৃতীয় স্থানে আছে। বরিশাল জেলার কলেজ সমূহের মোট ছাত্র সংখ্যা ৩২,২৪৮ এবং এর ২২% উজিরপুর উপজেলার (Disctrcit Statistics Barisal-2011)।

৪.৫. জনস্বাস্থ্য ঃ সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের লোকজন আগেকার দিনে নদী খাল পুকুরের পানি পান করত। ফলে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, জন্ডিস, কালোজ্বরে ভুগত। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা দিত। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক এ সমস্ত রোগে মারা যেত। ১৯৪৯, ১৯৫১ এবং ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ এ ৬ বছরে ৪৩,২২৪ জন লোক বিভিন্ন রোগে মারা যায়। এদের মধ্যে ৫০.৭৮% ম্যালেরিয়া এবং ৩১.৬৬% কলেরায় মারা যায় (টেবিল নং-৫)।

আমার মনে আছে ১৯৬০ সালে কলেরায় আমার বাড়ীতে কয়েকদিনের ব্যবধানে ৭ জন লোক মারা যায়। এ রোগের কোন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। গ্রামের ঝাড় ফোঁকই ছিল একমাত্র চিকিৎসা। তখনকার দিনে এরকম বিশ্বাস ছিল যে, কলেরা রোগ একটি অভিশাপ। কোন জীবানু এ রোগের কারণ নয় বরং ওভা নামক এক দানব ভর করলে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং এও বিশ্বাস ছিল যে, বাড়ীর চতুর্দিকে হায় আলী হায় আলী করে চিৎকার করে ফুঁক দিলে এ রোগের বিস্তার রোধ হয়। আমি

টেবিল ৪: শিক্ষার হারের চিত্র-২০০১

স্থানের নাম	৭ বছর +	পুরুষ	মহিলা
বাংলাদেশ	৪৬.১৫	৫৫.২৩	৪১.৭৬
বরিশাল বিভাগ	৫৩.৫৯	৫৫.৯৩	৫১.২২
বরিশাল জেলা	৫৫.২৮	৫৭.৬৯	৫২.৮২
উজিরপুর উপজেলা	৬১.০০	৬৩.৭০	৫৮.৩০
বামরাইল ইউনিয়ন	৬৬.৫১	৬৭.৩৩	৬৫.৭২
আটিপাড়া গ্রাম	৬৫.৯০	৬৬.১৮	৬৫.৬৫

উৎস ঃ *B.B.S আদমশুমারী-২০০১*

যখন ৭ বছর বয়সের তখন ফকিরের সঙ্গে বাড়ীর চুতর্দিকে ঘুরে ঘুরে চিৎকার দিয়ে এ রোগ তাড়াতে চেষ্টা করেছি। পরবর্তীকালে কলেরা বসন্তের প্রতিষেধক আবিস্কৃত হয় এবং পানীয় জলের জন্য বাড়ী বাড়ী টিউবওয়েল বসানো হলে এ রোগ এখন আর তেমন একটা দেখা যায় না। বর্তমানে ৯৯% খানাই নিরাপদ পানি পান করে থাকে (টেবিল-৩)। তবে টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক থাকাতে মানুষ আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত হচ্ছে। এক সময় এ অঞ্চলে অসংখ্য ডোবা নালা ছিল। এই সমস্ত ডোবা নালার পানি দূষিত হয়ে মশার বংশ বৃদ্ধি করত। মশার উপদ্রব বৃদ্ধিতে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটত। কলেরার মত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বহু লোক মারা যেত (টেবিল-৫ লক্ষ্যনীয়)। ষাটের দশকে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলে ক্রমান্বয়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হওয়াতে ঐ সকল রোগ ব্যাধিতে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার পূর্বে এ অঞ্চলে মাঠে বুক সমান পানি

টেবিল ৫: বরিশাল জেলায় রোগ ব্যাধিতে মৃত্যুর চিত্র (জন)

সাল	কলেরা	ম্যালেরিয়া	কালাজ্বর	বসন্ত	মোট	শতকরা
১৯৪৯	৬২২১	৮৩০৩	৭২১	৯৭	১৫৩৪২	৩৫.৪৯
১৯৫১	৩৪৯৩	৫৮৫৬	৪৪৬	৩৮০৫	১৩৬০০	৩১.৪৬
১৯৬০	২২২১	২১১২	৫০৯	১০৮	৪৯৫০	১১.৪৫
১৯৬১	৫৫৭	২৬৭০	৪৯১	৩১৭	৪০৩৫	৯.৩৩
১৯৬২	৬০৮	১৫৭৫	৩২৫	১৬৭	২৬৭৩	৬.১৮
১৯৬৩	৫৮৮	১৪৩৭	৩৩৪	২৬৩	২৬২২	৬.০৬
মোট	১৩৬৮৮ (৩১.৬৬)	২১৯৫৩ (৫০.৭৮)	২৮২৬ (৬.৫৪)	৪৭৫৭ (১০.০২)	৪৩২২৪	১০০

উৎস ঃ *Bangladesh District Gazetter Bakergonj, 1984.*

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যে ৬ বছরের মোটের শতকরা হিসাব দেখানো হয়েছে।

থাকতো। বাড়ি-ঘরের চারপাশ পানিতে থৈ থৈ করত। বর্ষাকালে নৌকা দিয়ে পানিতে মলত্যাগ ব্যতিত কোন উপায় থাকত না। পানি চলে গেলে নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ত। আশির দশক পর্যন্ত গ্রামের অধিকাংশ লোকেরা কাচা ও খোলা পায়খানা ব্যবহার করত। বর্ষাকালে এ সমস্ত খোলা পায়খানা পানি দূষিত করে নানা রকম রোগ-জীবাণু ছড়াত। এখন অধিকাংশ বাড়িতে সেনিটারী পায়খানা ব্যবহার করাতে রোগ-ব্যাধি হ্রাস পেয়েছে।

৪.৬ ঘরবাড়ি ঃ ৪/৫ দশক পূর্বে এই গ্রামের গরীবের ঘরগুলো ছিল খড়কুটো/বাঁশের তৈরি। ধনীদের বাড়িগুলো ছিল কাঠের নির্মিত দোতলা । গরীব লোকদের ঘর ছিল বাঁশ ও সুপারির খুঁটি দিয়ে নির্মিত এবং ছাউনি ছিল ছন, নারিকেল পাতা, তালপাতা এবং গোলপাতার। বাঁশের চাটাই, ধানের খড় এবং পাটখড়ি দিয়ে ঘরের বেড়া তৈরি হত। ধনী এবং স্বাচ্ছ্যন্দ পরিবারের বাড়ীগুলো দেখতে ছিল খুবই সুন্দর। মাঝখানে উঠান এবং চারিদিকে সারি সারি ঘর থাকত। প্রত্যেক বাড়ীতেই ২/১টি পুকুর ছিল এবং সারি সারি নারিকেল সুপারীর গাছ ছিল। বর্তমানে আগের অবস্থা আর নেই। লোকজনের আর্থিক অবস্থা এখন অনেক ভাল। ২০০১ সালে আদমশুমারীর হিসাব অনুযায়ী উপজেলায় ঝুপড়ী ঘরের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭.৫ ভাগ। এ গ্রামে বর্তমানে এখন আর ছনের এবং পাতার ঘর খুঁজেই পাওয়া যায় না। গ্রামের বেশিরভাগ এখন কাঠ ও টিনের কাঁচাঘর। অবস্থাপন্ন পরিবারের ঘরগুলো অধিকাংশই এখন আধাপাকা। আমি লক্ষ্য করেছি যে, গ্রামের ঘরগুলোর এক চতুর্থাংশ আধাপাকা হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ পাকা ঘরের সংখ্যা হাতে ঘোনা ৫/১০টি আছে। বর্তমানে যে সকল ঘরবাড়ী গড়ে উঠেছে তা অপরিকল্পিত। আগের মত গুচ্ছ ভিত্তিক নয়। বর্তমানে বাড়ীগুলো ছড়ানো-ছিটানো এবং তেমন আকর্ষণীয় নয়।

৫. দারিদ্র ও অভাব

সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলে এক সময় বর্তমানের রংপুর অঞ্চলের মত মঙ্গা বা অভাব দেখা দিত। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ আষাড় মাসে এবং কার্তিক মাসে চরম অভাব দেখা দিত। এ এলাকার অর্থনীতি প্রকৃতি নির্ভর। প্রায় প্রতি বছরই এ অঞ্চলে ঝড়-তুফান হয়ে থাকে। ১৫৮৪, ১৭৮৭, ১৮২২, ১৮৬৯, ১৮৭৬, ১৯১০, ১৯৬০, ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৯১ এবং ২০০৭ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। ঝড়ে ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে দেয় এবং বৃক্ষরাজি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। ১৯৮০, ১৯৮৫, ১৯৯১ এবং ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯ লক্ষ ঘর পুরোপুরি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও প্রায় ৩৩ লক্ষ গবাদি পশু প্রাণ হারায় (IUCN-2008)। বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছাস বার বার এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। এ সকল প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে এ অঞ্চলে দারিদ্রের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী। ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার পরে এ অঞ্চলে বর্ষায় মাঠে পানি পাওয়া যায় না। মুক্ত জলাশয়ের মাছ, শাপলা, শালুক ও নানা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ থেকে যে খাদ্য ও গো খাদ্য পাওয়া যেত তা এখন আর পাওয়া যায় না। এসব কারণে দরিদ্র মানুষের জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে গেছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। "Common Property resource often serves as a form of insurance that poor rural residents can turn to if they face setbacks in their primary income generating activities. A degrading environment significantly affects the access to this natural insurance of the people." Atiur et al-2002.

আমার এলাকায় মহিলারা মাঠে কাজ করে না। গার্মেন্টস শিল্পেও খুব কমই নিয়োজিত। দরিদ্র নারীরা আগেকার দিনে অন্যের বাড়িতে ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ করত। নানা জাতীয় রবিশস্য প্রক্রিয়ার কাজ

করত। নানা রকম কুটির শিল্পের কাজ করত। রাইস মিল্ চালু হওয়াতে এবং রবিশস্যের আবাদ হ্রাস পাওয়াতে নারীদের গৃহস্থলি কাজের আওতা হ্রাস পেয়েছে। অসহায় নারীদের কাজের সুযোগ হ্রাস পাওয়াতে দারিদ্র বেড়েছে।

জ্যৈষ্ঠ আষাড় মাস এবং কার্তিক মাসে প্রকট খাদ্যাভাব দেখা দিত। এ অভাবকে আঞ্চলিক ভাষায় আহাল বা আকাল বলা হত। উত্তর বঙ্গে যাকে মঙ্গা বলা হয়। উত্তর বঙ্গে এখনও প্রতি বছর মঙ্গা দেখা দেয়। আমার বাল্যকালে দেখেছি অভাবের সময় রংপুরের মঙ্গাকালীন সময়ের মত গরীব মানুষেরা কচু পাতা, কলার থোর, ডুমুরের ফল, বন্য শাকপাতার ঝোল খেয়ে বেঁচে থাকত। ধনীর বাড়ীর ভাতের মাড় গরীবেরা লাইন দিয়ে ভাগাভাগি করে খেত। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ এলাকায় প্রচুর তাল, খেজুর গাছ ছিল। এ সমস্ত গাছের রস বিক্রি করে গরীবরা মৌসুমী বেকারত্ব ঘুচাত এবং অভাব মোকাবেলা করতে পারত। আম, জাম, কাঠাল, কলা, খেয়েও ভাতের অভাব পূরণ করতো। রংপুর অঞ্চলে এ সুবিধা নেই বলে লোকজন নগদ টাকার সংকটের কারণে মঙ্গা মোকাবেলা করতে পারে না। উজিরপুর উপজেলার পশ্চিম উত্তর দিকে বৃহৎ সাতলার বিল অবস্থিত। বাঁধ দেওয়ার আগে এ বিলে কোন ফসল হত না। সাতলা বিল সংলগ্ন এলাকার অধিবাসীরা মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসা এবং ধান চালের ব্যবসায় জড়িত থাকত। ধান চালের ব্যবয়ীদের স্থানীয় ভাষায় কুটিয়াল বলা হয়। কুটিয়ালরা আকালের সময় গ্রামের গরিব মানুষদের নিকট বাকিতে ধান বিক্রি করত। ফসল তোলার পরে মূল্য পরিশোধ করতে হত। ক্রয়কৃত মূলের অতিরিক্ত ৫০ থেকে ১০০% পর্যন্ত বেশি দাম দিতে হত। কুটিয়ালদের অতিরিক্ত লাভ সত্বেও তখনকার দিনের অনেক অভাবগ্রস্ত মানুষ বেঁচে থাকতে পেরেছে। বর্তমানে অভাব অনেক হ্রাস পেয়েছে। অকৃষি খাতের ব্যাপক বিকাশ দারিদ্র ও অভাব হ্রাসে ভূমিকা পালন করেছে। উফশীর আবাদ শুরু হওয়ার পর থেকে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের আকাল এখন আর তেমন তীব্র নয়। বিগত কয়েক দশক ধরে লোকজন খুলনার পাটকলে এবং ঢাকায় নানা পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। ব্যাপক মাইগ্রেশনের ফলে শহর থেকে গ্রামে পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. উপসংহার

গ্রামের অর্থনীতিতে ব্যাপক আর্থিক প্রসার ঘটেছে। বস্তুবাদী উন্নয়ন হয়েছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষ ঘটেছে বলে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে এবং নিউক্লিয়ার পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ অঞ্চলের জনগণ অতিথি পরায়ণ ছিল কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। লোকজন পরিশ্রমী, উদ্যমী ও সাহসী। জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটেছে। মানুষ উন্নত জীবন যাপনে প্রত্যাশী হয়ে উঠেছে। কর্মে আগ্রহী হয়েছে , ফলে আয়-রোজগার বেড়েছে। সঞ্চয় এবং বিনিয়োগে উৎসাহ বোধ করছে। এনজিওদের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেলেও পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। বিশ্বায়নের সুস্পষ্ট প্রভাব এ গ্রামের অর্থনীতি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পড়েছে। নানামুখী ভোগ-বিলাস বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুজাতিক কর্পোরেশনের রাহুগ্রাস সুদুর পল্লীতেও প্রসারিত হয়েছে। জনগণের ভোগ চাহিদা তালিকা বহুজাতিক কর্পোরেশনের সদর দপ্তরে নির্ধারিত হচ্ছে। গ্রাম এলাকায় বস্তুগত উন্নয়নের ব্যাপক সাড়া পড়লেও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। অপরিকল্পিত বাড়ী ঘর তৈরি হচ্ছে বলে চাষের জমি ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। নতুন বাড়ির মালিক গাছ লাগিয়ে ছায়া ফেলে এবং গবাধি পশু ও হাঁস-মুরগি দিয়ে অন্যদের ফসলের ক্ষতি সাধন করছে। এ ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন। গুচ্ছ বাড়ি নির্মাণ, বহুতল ভবন নির্মাণ করলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পাবে না। এ লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণীত হওয়া প্রয়োজন।

উফশী জাতের ব্যাপক প্রচলনের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে এবং পরিবেশ ধ্বংসের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর কর্মের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে ও জীবিকার সুযোগ নষ্ট হয়েছে। এই গ্রামের কৃষি উন্নয়নের জন্য বড় খালগুলি পুন:খনন করা প্রয়োজন। সেচ সুবিধা কম বলে চাষযোগ্য জমির মাত্র ১৭% জমিতে সেচ করা হয়। উপজেলায় এ হার ৫৫% এবং জেলায় তা ২৯% (কৃষি শুমারী-২০০৮)। ঠান্ডা বিবির খাল এবং সিকারপুর-গৌরনদী খাল পুনঃখনন করলে উজিরপুর ও গৌরনদী উপজেলার বিরাট এলাকার কৃষকরা উপকৃত হবে। কৃষিতে Crop Diversification করার উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। কৃষির অন্যান্য খাত সমূহের উন্নয়নের প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন। এ গ্রামে শিক্ষার হার সন্তোষজনক হলেও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার তেমন সুযোগ নেই। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক।

এনজিওরা মহাজনের জায়গা দখল করেছে। সুদী কারবারের শোষণ অত্যাচার থেকে মানুষ মুক্তি পায়নি। ঋণগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা বৃটিশ আমলের মত রয়ে গেছে। ২০০৮ সালে কৃষি শুমারীর তথ্য মোতাবেক উজিরপুর উপজেলায় ৬৭% কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত এবং শতকরা ৩৬%ভাগ কৃষকের ঋণের উৎস এখনও অপ্রাতিষ্ঠানিক। সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করা উচিত।

উজিরপুর উপজেলায় ২০০৭ সালের সিডর এবং পরবর্তী সময় গো-মড়কে ৫৯৬২টি গরু মারা যায় এবং ১,১০,০৪১টি বিভিন্ন জাতীয় পাখি মারা যায়। প্রায় প্রতি বছরই এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সংঘঠিত হয়। International Union for Conservation of Nature, December, 2008 এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয় যে, The tropical cyclones of the Bay of Bengal for the period of 130 years (1877-2007) , it is found that a total of 539 tropical cyclones were formed during that period. On an average 4.1 tropical cyclones are formed per year, of which 1.5 belongs to intensive categories with wind speed greater than 88 km/hour (IUCN, December-2008). ঘূর্ণিঝড়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং জেলেরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমগ্র উপকূলীয় জেলা সমূহের জেলে ও কৃষকদের জন্য সহজ ঋণ নীতি গ্রহণ করা উচিত। উপকূলীয় জেলা সমূহে ব্যাপক আকারে শস্য বীমা চালু করা জরুরী।

এ গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য বলতে কেবল খাদ্য শস্যকে নয়। মাছ, মাংস, শাক-সবজি, তরকারি এবং ফলফলাদিকে খাদ্য হিসেবে ধরতে চাই। ভাত, মাছ, ডাল ও শাক-সবজি এলাকার মানুষের প্রধান খাদ্য। এখন এ গ্রাম তথা সমগ্র বরিশাল অঞ্চল সকল প্রকার খাদ্য খাটতি অঞ্চল পরিণত হয়েছে। আগে গ্রামের প্রায় সকল পরিবারই গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগি পালন করে আমিষের প্রয়োজন মিটাত। বর্তমান কালে কৃষির সকল খাতে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে। গৃহপালিত পশু-পাখির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। আমিষের খাটতিও ব্যাপক হারে বেড়েছে। এখন গ্রামের গরীবদের কাছে মাছ, মাংস, ডাল ও ফলফলাদি বিলাসী খাদ্যে পরিণত হয়েছে। কৃষির সকল উপখাতের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সুচিন্তিত কৌশল ও প্রযুক্তি গ্রহণ করা জরুরী।

জেলার মোট উৎপাদিত ধানের ১৪% এবং বোরো ধানের ২৮% ও গোল আলুর ৪৮% উজিরপুর উপজেলায় উৎপাদিত হয় (District statistics Barisal-2011)। ধান উৎপাদনে উপজেলার অবস্থান ভাল হলেও আমার গ্রামটির অবস্থা সন্তোষজনক নয়। গ্রামের খালগুলো শুকিয়ে যাওয়াতে উফসী জাতের ধানের আবাদ হ্রাস পেয়েছে। যে খাল-নালা এ জনপদকে শস্য-শ্যামল ও সমৃদ্ধ করেছিল তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা আমি শুনতে পাই। ঠান্ডার খাল সহ ছোট ছোট নালাগুলো পুন:খনন করা হলে এলাকাটি তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে।

রেফারেন্স

১। অর্থ মন্ত্রণালয়-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১১

২। আহমেদ সিরাজ উদ্দীন-বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার ইতিহাস-স্মরণিকা-উজিরপুর থানা সমিতি-মে, ১৯৯২

৩। আহমেদ সরদার সৈয়দ-সিডর বিধ্বস্ত উপকূলীয় বিষন্ন অর্থনীতি-সাময়িকী-বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি-২০১২

৪। আহমেদ সরদার সৈয়দ-উত্তর বঙ্গে মঙ্গা-২০০৩-একটি গ্রাম জরিপ-সাময়িকী বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি-২০০৭

৫। BBS-Statistical Pocket Book-Bangladesh-1996-2012.

৬। BBS-Bangladesh Population Census-Zila-Barisal, April-2005

৭। BBS- Population Census-Volume-1, Prelimenery Report October-2007.

৮। Barkat Abul et-al-Fate of Bangladesh Agriculture amidist Globalization-Some Critical Issues-BEA Journal-2002.

৯। BBS Census of Agriculture 1996-Zila Series-Barisal-2000.

১০। BBS Census of Agriculture 2008- Zila Series-Barisal-2011.

১১। BBS – District Statistics, Barisal-2011

১২। BBS – Monthly Statistical Bulletin, Bangladesh, August-2013

১৩। বারসিক-আলোচনা সহায়িকা-স্থায়ীত্বশীল কৃষি ও লোকায়ত জ্ঞান-এপ্রিল' ২০০৬ (সুকান্ত সেন ও কামরুজ্জামান সাগর সম্পাদিত)

১৪। Hussain S G-Impact of Climate Change in Agriculture-Case study on Shudharam & Subarnachar Upzilas of Noakhali District-IUCN September-2008.

১৫। Rahman Atiur et-al-Environment Poverty Linkages in Bangladesh Perspective-Need for Sustainable Development-BEA Journal-2002.

১৬। Rahman Atiur et-al- People's Report-2004-2005-Bangladesh Environment.

১৭। Quadir Dewan Abdul et-al-Tropical cylone: Impacts on coastal livelihood-IUCN December-2008.

১৮। সংস্তাপন মন্ত্রণালয়, জেলা গেজেটিয়ার রংপুর, ১৯৯০।

১৯। সংস্তাপন মন্ত্রণালয়, জেলা গেজেটিয়ার বরিশাল, ১৯৮৪।

পরিশিষ্ট

টেবিল ১ : বরিশাল জেলা দারিদ্র চিত্র (১৯৪০-১৯৫২)

ক্রমিক নং	স্তর	শতকরা
১	স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে	৪০.২০
২	স্বাচ্ছন্দ্যের নিম্নস্তরে	১৭.৭০
৩	উপবাসের উপরের পর্যায়ে	২১.৬০
৪	উপবাসের পর্যায়ে	২০.৫০

উৎস ঃ জেলা গেজেটিয়ার বরিশাল-১৯৮৪ (১৯৪০-১৯৫২ সালের ভূমি জরিপ)

টেবিল ২: কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য (বরিশাল)
(সের প্রতি টাকায়)

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	১৯৭১ সাল	১৯৭৬ সাল	২০১৩ জুলাই
১	চাল মধ্যম	১.০৪	২.৭৯	৩৬.০০
২	মসুর ডাল	১.০১	২.৯২	১২০.০০
৩	পিঁয়াজ	০.৮৬	১.৬৯	৪০.০০
৪	রসুন	০.৮৬	৩.৯৫	৪০.০০
৫	শুকনা মরিচ	৩.৬৩	৭.৪৫	১৪৮.০০
৬	লবন	০.২৫	১.২৫	৩০.০০
৭	সরিষা বীজ	৪.৮২	৪.৩৪	১৫৯.০০ (তেল)
৮	নারিকেল তেল	৬.১৬	১৪.৮২	৪২০.০০
৯	গোল আলু	০.৭৪	১.৫০	১৪.০০
১০	রুই মাছ	৪.৯৪	১৪.৫০	২২০.০০
১১	ইলিশ মাছ	৪.০০	৯.৭৫	৮২০.০০
১২	গরুর মাংস	২.২৫	১০.০০	২৬৪.০০
১৩	ডিম (১০০টি)	১৫.০০	৫৫.০০	৮২৫.০০

উৎস ঃ জেলা গেজেটিয়ার বরিশাল-১৯৮৪
Monthly Statistical Bulletin Bangladesh-August-2013

টেবিল ৩: শিক্ষার হার বৃদ্ধির চিত্র-২০১১

স্থানের নাম	উভয়	পুরুষ	মহিলা
বাংলাদেশ	৫১.৭৭	৫৪.১১	৪৯.৪৪
বরিশাল বিভাগ	৫৬.৭৫	৫৭.৬২	৫৬.৯৩
বরিশাল জেলা	৬১.২০	৬০.৬০	৬১.২০
উজিরপুর উপজেলা	৬২.৫০	৬৪.০৯	৬১.১০

উৎস ঃ *Statistical Pocket Book Bangladesh-2012, District Statistics Barisal-2011*

টেবিল ৪: বরিশাল জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

উপজেলা	কলেজ	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	প্রাথমিক বিদ্যালয়	*রেজিষ্টার্ড প্রাঃ বিঃ	মোট প্রাঃ বিঃ	*মাদ্‌রাসা
আগৌলঝরা	১	২৯	৬৫	৩০	৯৫	৬
বাবুগঞ্জ	৩	৩৫	৬৯	৬০	১২৯	১৮
বাকেরগঞ্জ	১১	৮০	১৫৬	৯৮	২৫৪	৬৩
বানরিপাড়া	৪	৩৩	৮০	৪২	১২২	২০
বরিশাল সিঃ ক:	১০	৩৭	৫৬	১৩	৬৯	১০
বরিশাল সদর	১০	৪৪	৭৭	৪২	১১৯	২৭
গৌরনদী	৬	২৬	৪৭	৩০	৭৭	১৫
হিজলা	২	১৭	৫৫	২৫	৮০	৯
মেহেন্দীগঞ্জ	৫	৩৬	১২৪	৬৮	১৯২	২৭
মুলাদী	৬	৩৭	৭৮	৫১	১২৯	২০
উজিরপুর	১২	৫০	১০৪	৭১	১৭৫	২২
মোট	**৭০**	**৪২৪**	**৯৫০**	**৫৩০**	**১৪৮০**	**২৩৭**

** বর্তমানে সকল রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়েছে।*

** মাদ্‌রাসা এফতেদায়ী ব্যতিত।*

উৎসঃ *District Statistics Barisal-2011*

টেবিল ৫ : ধ্বংসপ্রাপ্ত / প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটির শিল্প

ক্রমিক নং	কাঁচামাল	দ্রব্যের নাম	মন্তব্য
১.	বাঁশ ও বেত	ঝুঁড়ি, খাড়ই, হাজি, বটুয়া, পুরা, ঢালা, কুলা, চালনী,	হাজি এক প্রকার ঝুঁড়ি। খাড়ই মাছ রাখার ছিদ্রপাত্র। বটুয়া ও কুলা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হত।
		চাই, বাইন্না, বুচনাই, হোচা, পোলো,	মাছ ধরার ফাঁদ বিশেষ
২.	তাল, খেঁজুর পাতা	পাখা, পাটি, তার	তালগাছের পাতার গোড়া থেকে তৈরি শক্ত তারের মত, যা মাছ ধরার ফাঁদ বানাতে ব্যবহৃত হত।
৩.	নারিকেল	হুক্কা, মালই, ছোবরা, পাপোস	মালই নারিকেলের খোঁসা থেকে তৈরি এক প্রকার চামচ।
৪.	ঝিনুক	চামচ	ঝিনুকের খোলস দিয়ে তৈরি হাতল ছাড়া এক প্রকার চামচ।
৫.	পাট	ছিকা, রশি	
৬.	মাটি	পাতিল, হাড়ি, বাসন, বাটি, মাইট, মটকা, কলসি	
৭.	পুরাতন কাপড়	কাঁথা সেলাই	
৮.	কাঠ, পাতা	খড়ম, ঢেঁকি, জোংরা, বিড়ি, মাতাল, গোটনী, চামচ, বিভিন্ন প্রকার নৌকা	খড়ম এক রকম সেন্ডেল। জোংরা এক প্রকার ছাতা।
৯.	শামুক	চুন	শামুক পুঁড়িয়ে উন্নতমানের চুন তৈরি হয়।
১০.	নল, হোগলা পাতা	মাদুর, হোগলা	